Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXI, June 2014

ব্র্যান্ডা আলমন্ড : বন্ধন ও অবন্ধন প্রসঙ্গে

জি. এম. তারিকুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** প্রাচীনকাল হতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দার্শনিক আলোচনা নিজস্ব ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জন্ম দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় দর্শনের একটি নতুন সংযোজন হলো প্রায়োগিক দর্শন। দর্শনের মতবাদগুলো হলো বিমূর্ত। জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিমূর্ত দার্শনিক মতবাদকে যখন দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা হয় তখন একে প্রায়োগিক দর্শন বলে। আর আমরা যখন প্রায়োগিক দর্শনের কথা বলি তখন আমরা এর ব্যবহারিক দিকের কথা বলি। প্রায়োগিক দর্শন অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মতো দর্শনকে আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহার করার গুরুত্বকে তুলে ধরে। সুতরাং বাস্তব জীবনে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেসব ক্ষেত্রে দর্শনের প্রয়োগ নিয়েই প্রায়োগিক দর্শন কাজ করে। আর এ কাজ করতে গিয়ে প্রায়োগিক দর্শন চারপাশের পরিবেশ সংক্রান্ত ও মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবরিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ব্র্যান্ডা আলমন্ড মানুষের সর্ম্পক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বন্ধন এবং অবন্ধনের মধ্যে তুলনা করেছেন, দেখিয়েছেন কোনটি বেশি প্রয়োজনীয়। তিনি অবন্ধনের সমালোচনার মাধ্যমে বন্ধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বন্ধন ও অবন্ধন সর্ম্পকে ব্র্যান্ডা আলমন্ডের মত অনুসরণে মানবজীবনে বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।]

মানব বন্ধন

মানুষে মানুষে যে সর্ম্পক তা কেমন হবে, এই সর্ম্পকের ভিত্তি কি বা আমরা কোন ধরনের সর্ম্পক কামনা করি এসব বিষয় নিয়ে মানব বন্ধন আলোচনা করে। সাধারণত পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের যে সর্ম্পক গড়ে ওঠে তাকে মানব বন্ধন বলে। এই সর্ম্পককে আমরা মানব সর্ম্পকও বলতে পারি। মানুষ বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, সংস্থা

* জি. এম. তারিকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ও সংগঠন গঠনের মাধ্যমে বন্ধন গড়ে তোলে যেখানে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা ভুলে একত্রিত হয় এবং একে অন্যের ওপর পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল হয়। ব্র্যান্ডা আলমন্ডের ভাষায়, “Invisible bonds exist between people, knitting them into groups, communities or pairs, destroying their atomicity, making them interdependent rather than independent,... joined together rather than solitary.”[১]

আধুনিককালে আমরা মনে করি মানব বন্ধন মানসিক শান্তি দেয়। মানুষ বন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সুখ অন্বেষণ করে। কারণ এখানে ভালবাসা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মানুষের মধ্যে এই সম্পর্ক লক্ষ করি। মানব সভ্যতার ইতিহসে মানব বন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত মানব বন্ধনই হল মানব সভ্যতার ভিত্তি। আর এজন্যই শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মতো দর্শনেও এই সম্পর্ককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার অন্যান্য শাখা যেমন সমাজবিজ্ঞান বন্ধন কেন ভেঙ্গে যায় তা নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু মূল্যায়ণ বা নৈতিকতার বিষয় এখানে আলোচনা করা হয় না। কিন্তু দর্শন সার্বিকভাবে আলোচনা করে ও সিদ্ধান্ত দেয়। এখানে নীতিবিদ্যার একটি দৃঢ় ভূমিকা দেখা যায়।

বন্ধনের শ্রেণীবিভাগ

আলমন্ড তাঁর এই আলোচনায় বন্ধন ও অবন্ধনের মধ্যে তুলনা করেছেন। সেই সাথে মানব জীবনে বন্ধনের ক্ষেত্রে তিনি তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগ দেখিয়েছেন:

১. জৈবিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন (Biological and Natural Bond)
২. আইনগত বা বৈধ এবং কৃত্রিম বন্ধন (Legal and Artificial Bond)
৩. সামাজিক ও ঐচ্ছিক বন্ধন (Social and Voluntary Bond)

এখন এগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো :

(১) জৈবিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন

পিতা- মাতা ও সন্তান, ভাই ও বোনের মধ্যে যে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক বর্তমান থাকে তাকে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক বন্ধন বলা যায়। এই বন্ধন স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। এই জৈবিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে কোন ধরণের নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। এখানে এক ধরনের কর্তৃত্ব দেখা যায়। পিতা-মাতা সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার স্বামী স্ত্রীর উপর আধিপত্য দেখায়। এখানে কর্তৃত্ব এবং

শোষণ করার মধ্যে দিয়ে সর্ম্পকের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। আর তখন ব্যাক্তির মর্যাদা সেখানে গুরুত্ব পায় না।

(২) আইনগত বা বৈধ এবং কৃত্রিম বন্ধন

এই বন্ধন পারস্পরিক সমঝোতা এবং চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। বৈবাহিক বন্ধন হলো এই ধরণের বন্ধনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কেননা বিভিন্ন ধরণের বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরণের চুক্তি, সমঝোতা ও শর্ত দেখতে পাই। যেমন – মুসলিম বিবাহরীতি অনুযায়ী কাবিন নামায় বিভিন্ন ধরণের শর্ত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশার ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার পরিবারকেও আমরা আইনগত ও কৃত্রিম বন্ধন বলতে পারি কারণ এটি মানুষের তৈরি।

(৩) সামাজিক ও ঐচ্ছিক বন্ধন

কারো সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে বা যে কোন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে এই ধরণের বন্ধন গড়ে ওঠে। পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক তৈরি হয়। আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে সাামাজিক দায়বদ্ধতা ও সর্বসাধারণের উপকার সাধন। এই ধরণের বন্ধন সাময়িক এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

সমাজের Pattern বা ধরনের পরিবর্তনের কারণে উপওে উল্লেখিত শ্রেণী বিভাগকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় না। এসব বন্ধনের মধ্যে অনেক সময় আন্তঃসর্ম্পকের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জৈবিক বন্ধন হয়ে যায় আইনগত বন্ধন আবার আইনগত বন্ধন হয় সামাজিক বন্ধনের মতো। এই বিষয়টি নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষাপট থেকে এটি বিচার করছি তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যখন Cousin বা Kinshipগুএর মধ্যে বিয়ে হয় তখন তা জৈবিক বা প্রাকৃতিক বন্ধন থেকে আইনগত বা কৃত্রিম বন্ধনে রূপান্তরিত হয়। আবার এই বন্ধনকে আমরা সামাজিক বন্ধনও বলতে পারি।

মানুষের জন্যই বন্ধন। আবার বন্ধন অনেক সময় আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। মানুষের জন্যই বন্ধন হল আপাত বিরোধী সত্য। বন্ধন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং তেমনি মানুষের মধ্যে সমস্যাও সৃষ্টি করে। জৈবিক ও প্রাকৃতিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে দেখি যে অভিভাবক ও সন্তানের মধ্যে কর্তৃত্বের সর্ম্পক সৃষ্টি হয়। অভিভাবকরা সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব করেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এখানে কর্তৃত্ব ও শোষণ করার কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর এমন ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি

তখন গুরুত্ব পায় না। অনূরূপভাবে, আইনগত ও কৃত্রিম বন্ধনে দেখি যে বিবাহ ও পরিবারের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যেও কর্তৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব করে এবং নারীরা এভাবেই শোষিত হতে থাকে। সামাজিক ও ঐচ্ছিক বন্ধনের ক্ষেত্রেও এই শোষণের বিষয়টি দেখা যায়। রাজনৈতিকভাবে এবং ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে মানুষকে এখানে শোষণ করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বন্ধনের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছে। তবে আমরা জানি যে, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, বাধ্যবাধকতাবোধ,অধিকার প্রভৃতি কৃত্রিম বিষয়গুলো বন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সর্ম্পকে ব্র্যান্ডা আলমন্ড বলেন,

> "The nature of the bond may be spelled out in terms of duties, obligation and rights. And yet the bond is strong enough to override situations in which duties are disregarded, obligations ignored, rights violated."[২]

অর্থাৎ দায়িত্ববোধ, বাধ্যবাধকতাবোধ, অধিকার এসব বিষয়কে অবজ্ঞা করলে বন্ধনের মধ্যে কর্তৃত্বের ও শোষণের সৃষ্টি হয়। তাই বন্ধনের ক্ষেত্রে আমাদের এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। নৈতিকতাবোধও এখানে কাজ করবে। নৈতিকতাবোধ থাকলে কর্তৃত্ব করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন বন্ধনগুলো নৈতিক সম্মত করার মাধ্যমে কিভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায় তা নিয়ে দর্শন আলোচনা করে।

অবন্ধন

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানব সর্ম্পকের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। পাশপাশি মানব সর্ম্পকের অবনতি বা ভাঙনও আমরা দেখতে পাই। অবন্ধন সাধারণত মানুষে মানুষে যে সর্ম্পক তা অস্বীকার করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে মতবাদ মানুষের প্রেমগু প্রীতি, সৌহার্দ্য-ভালবাসা, বিবাহ-দাম্পত্যজীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদিকে অস্বীকার করে তাকে অবন্ধন (unbonding) বলে। আর পারিবারিক ভাঙন মানে সামাজিক ভাঙন। অবন্ধন স্থায়ী ও অস্থায়ী সব ধরণের সর্ম্পককে অস্বীকার করে। ব্র্যান্ডা আলমন্ড তাঁর আলোচনায় তিনটি দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করেছেন যেখানে বন্ধনকে স্বীকার না করে অবন্ধনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মতবাদ তিনটি হলো:

(১) স্টোয়িকবাদ (Stoicism)
(২) অস্তিত্ববাদ (Existentialism)

(৩) নারীবাদ (Femininism)

এখন উল্লেখিত তিনটি মতবাদ সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করা হলো :

(১) স্টোয়িকবাদ

স্টায়িকবাদ খ্রিষ্ঠপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বের দর্শন। গ্রিক দর্শনের শেষের দিকে এই দর্শন আমরা পাই। জেনো এই মতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদ বন্ধনকে স্বীকার করে না। তাঁরা বলেন, মানসিক শান্তির জন্য এ ধরনের সর্ম্পক থেকে বিরত থাকা উচিত। W . A. Oldfather অনুদিত *Arrian's Discourse of Epictetus* - এ সর্ম্পকে উল্লেখ পাওয়া যায়,

> Whenever you grow attached to something, do not act as through it were one of those things that cannot be taken away, but as though it were something like a jar or crystal goblet, so that when it breaks you will remember that it was like, and not be troubled. So too in life ; ... remind yourself that the object of your love is mortal; it is not one of your own possessions ; it has been given to you for the present, not inseparably nor forever.[৩]

সুতরাং দেখা যায় যে, তাঁরা মানব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সুখ পেতে চেয়েছেন। এজন্য তারা আত্মহত্যাকে উৎসাহ দিতেন। তাঁরা এই আত্মহত্যাকে Voluntary death বলতেন। এজগৎ স্থায়ী নয়, স্থায়ী হল মৃত্যুর পরের জগৎ। তাহলে মানুষের পরম লক্ষ্য হল মৃত্যু। পারলৌকিক জীবনকে পাওয়ার জন্য বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে, শাশ্বত হতে হলে বন্ধনকে মুক্ত করতে হবে। তারা জীবন নাশের মধ্যে দিয়ে জীবনের কল্যাণ লাভের চেষ্টা করেন। জেনো নিজেও আত্মহত্যা করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। বৌদ্ধ দর্শন, সূফীদর্শন ও এভাবে সংসার ত্যাগের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায়। অর্থাৎ স্টোয়িকদের ভাষ্য অনেকটা এরকম,

> মানুষের জীবন যখন চরম অমানবিক বেদনায় আপ্লুত থাকে, বেঁচে থাকার অসহনীয় বেদনার কারণে মানুষ যখন বেঁচেথাকা থেকে মুক্তি পেতে চায় তখন বেঁচে থাকার যৌক্তিকতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। দু:খ-মুক্তির সব পথ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন একমাত্র উপায় অবশিষ্ট থাকে, যা হলো জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে দু:খের অবসান ঘটানো। এই অর্থে আত্মহত্যা হলো দু:খ মোচনের শেষ উপায়। যেহেতু এটা শেষ উপায় এবং এর কোন বিকল্প নেই, তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে মানুষ বাধ্য হয়– মানুষ ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করে তা নয়, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।[৪]

তাই তাঁরা মানুষকে আত্মহত্যা করতে উদ্bুদ্ধ করতেন, সাংসারিক বন্ধনের প্রতি ছিলেন চরম অমনোযোগী। কিন্তু আলমন্ড বলেন যে, আমরা জীবন নাশের মাধ্যমে বা সংসার ত্যাগের মাধ্যমে কখনো কল্যাণ পেতে পারিনা। এটি মানবতা বিরোধী মতবাদ, তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া তাদের এই আত্মহত্যার ধারণাকে অন্যান্য দর্শন যেমন- কান্টের দর্শনে অস্বীকার করা হয়েছে। এমনকি সকল ধর্মেও একে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং বন্ধন বিরোধী তাঁদের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) অস্তিত্ববাদ

সমকালীন দর্শনের একটি অন্যতম ধারা হলো অস্তিত্ববাদ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরাও স্টোয়িকদের মতো বন্ধনকে অস্বীকার করেন। অস্তিত্ববাদ অস্তিত্বের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে, সব মানুষের একটি গুণ আছে আর তা হল অস্তিত্ব। অস্তিত্ববাদের দুটি ভাগ আছে– আস্তিক এবং নাস্তিক। নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক নীট্শে, জ্যঁা পল সার্ত প্রমূখ অবন্ধনের কথা বলেছেন। তাঁরা পারিবারিক জীবন, বিবাহকে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন এগুলো ইচ্ছা করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাঁদের মতে, মানুষ আগে অস্তিত্বশীল, তারপর সে কি হবে, কেমন হবে এসব আসবে। প্রচলিত বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন। ঈশ্বরের সাথে মানুষের বৈশিষ্ট্যকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে।

অস্তিত্ববাদ অনুসারে প্রত্যেক সত্তা বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন সত্তা। অস্তিত্বের মাধ্যমে এখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নাস্তিক অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন এই জীবনই একমাত্র জীবন, এই জীবনে অস্তিত্বের মাধ্যমে নিজের সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্বাধীনভাবে।আর স্বাধীন বলেই ব্যক্তি নিজেকে ইচ্ছানুযায়ী সাজাতে পারে। মানুষের প্রকৃতি পূর্ব নির্ধারিত নয়। মানুষ জন্ম থেকে তার গুণগুলো নিয়ে আসে না। এগুলো সে অর্জন করে এবং নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে নিজের সত্তাকে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল করে।[৫] স্বাধীন ইচ্ছায় আমরা বিভিন্ন গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করি, আর এ কারণেই আমরা মানুষ, বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মানুষ নই। সার্ত বলেন, আমি আমার নিজেকে সাজাই এবং আমার সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি হল এখানে মূল। অত্যধিক গুরুত্বের ফলে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত

থাকে এবং বহির্জগত হতে বিচ্ছিন্ন থাকে।[৬] ব্যক্তি বিশেষের ওপর এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে স্বীকার করে বলা হয় যে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে। ব্যক্তি সত্তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অস্তিত্ববাদ বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দেয়। যেহেতু ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে তাই এখানে অবন্ধন বিদ্যমান। তাই সমাজ থাকলেও মানুষের সাথে মানুষের কোন বন্ধন থাকে না। তাই অবন্ধন সর্ম্পকে অস্তিত্ববাদীদের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে আলমন্ড বলেন,

> "It is the ideal of the selfcreated free personality, independent of emotional ties beyond those of immediate inclination, and moving from relationship to relationship in strong and unregretful isolation."[৭]

সুতরাং আমরা যেখানে বাস করি সেখানে আমাদের যে বন্ধন সৃষ্টি হয়, সেই বন্ধনকে অস্তিত্ববাদ অস্বীকার করে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় যে সংঘ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আলমন্ড এর সমালোচনা করে বলেন যে, মানুষের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কখনো অস্তিত্বশীল হতে পারি না। তাই এই মত গ্রহণ করা যায় না।

(৩) নারীবাদ :

নারীবাদ সর্ম্পকিত প্রথম আলোচনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই প্রাচীন গ্রিসের পিথাগোরীয় ও প্লেটোর দার্শনিক আলোচনায়।[৮] নারীবাদ নারীর অধিকার, মর্যাদা ও মুক্তির কথা বলে। নারীবাদের মূল লক্ষ্য হল নারী স্বাধীনতা। এ সর্ম্পকে আমরা বিভিন্ন ধরনের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই। যেমন : উদারপন্থি নারীবাদ, রেডিক্যাল নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ।

উদারপন্থীরা নারীর বিরুদ্ধ বৈষম্য ও সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য দূর করার জন্য সমাজ সংস্কারের কথা বলেন।[৯] উদারপন্থী নারীবাদীদের মধ্যে মেরী উলস্টোনক্রাফট, বেটি ফ্রিডান, হ্যারিয়েট টেইলার, এবং জন স্টুয়ার্ট মিল অন্যতম। তাঁরা রাজনৈতিক অধিকার, নির্বাচনের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেন। তাঁদের মতে, পুরুষের মত নারীরও পৃথকভাবে এসব অধিকার থাকতে হবে।

মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদে বলা হয় যে, সমাজে নারীকে পুরুষের অধঃস্তন করে রাখা হয়েছে। তাই এখানে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে

সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়। এখানে বিশ্বাস করা হয় যে, নারীরও পুরুষের মতো স্বতন্ত্র গুণ ও ক্ষমতা রয়েছে। তাদের এই গুণ ও ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত নারীবাদী মতবাদে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর ভিন্নতার কথা, ভিন্ন অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রেডিক্যাল নারীবাদে নারী ও পুরুষকে সার্বিকভাবে পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে। রেডিক্যাল নারীবাদীদের মধ্যে কেট মিলেট, সুলামিথ ফায়ারস্টোন, মেরিলিন ফ্রেন্স ও মেরী ডেলী অন্যতম। রেডিক্যাল নারীবাদ একেবারে প্রথম দিকের নারীবাদ। রেডিক্যাল নারীবাদীরা পুরুষবিবর্জিত নারী সমাজের কথা বলেন। রেডিক্যাল নারীবাদ নারীর স্বতন্ত্র গুণ বা অভিজ্ঞতার কথা বলে যা শুধু নারীর বেলায় প্রযোজ্য, যা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[১০] এই মতানুসারে নারীর এক ধরনের গুণ আছে যা পুরুষের গুণের চেয়ে ভিন্ন। নারী বা পুরুষের কোন গুণকে তাঁরা খাটো করে দেখেন না। তাঁরা বলেন, নারী ও পুরষ সবাই হচ্ছে সমান, সকলের সমান অধিকার আছে। তাঁদের মতে, পুরুষের এমন গুণ আছে যা নারীর নেই আবার নারীরও এমন গুণ আছে যা পুরুষের নেই। এভাবে তাঁরা পুরুষের গুণকে অবজ্ঞা না করে বরং নারীর গুণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যেহেতু নারী ও পুরুষের গুণের প্রকৃতি ভিন্ন তাই তাঁদের মতে, পুরুষের সাথে সর্ম্পক ত্যাগ করতে হবে। পুরুষদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। এখানে তাঁরা পারিবারিক সর্ম্পক অস্বীকার করার পাশাপাশি জৈবিক সর্ম্পককেও অস্বীকার করেছেন।

আলমন্ড রেডিক্যাল নারীবাদ সমালোচনা করেন। এভাবে অবন্ধন দ্বারা বন্ধন মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কেননা এখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেবল প্রকৃতির নিয়মের মাধ্যমেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই আমরা রেডিক্যাল নারীবাদের অবন্ধন সম্বন্ধীয় মত গ্রহণ করতে পারি না। তবে এই নারীবাদের একটি ভাল দিক হলো এই যে, এটি নারী বৈষম্যকে এবং নারীর ওপর সমাজে যে অত্যাচার হয় তাকে তুলে ধরে।

আমরা যখন কোন সমাজ ব্যবস্থাকে অগ্রগতির সাথে যুক্ত করতে চাইবো আমাদেরকে তখন নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা ভাবতে হবে। মানব সমাজের কথা যখন আমরা বিশ্লেষণ করবো তখন অনায়াসে অর্ধেক নারী সদস্যের বিষয় আমাদের সামনে চলে আসে। তাই সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী সদস্যের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীবাদকে ক্ষেত্র বিশেষ অবশ্যই সমর্থন করবো। তবে রেডিক্যাল নারীবাদ কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

কারণ রেডিক্যাল নারীবাদীরা মানব সমাজ, সংসারের বাইরে গিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তারা নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ককে মেনে নিতে চান না। কিন্তু বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো পরিবার, সমাজ ও বিশ্ব হচ্ছে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিদিনের ফসল। তাই বিশ্বে মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে নারী-পুরুষের বন্ধন বা সম্পর্ক অপরিহার্য।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে আলমন্ড অবন্ধন সংক্রান্ত মতবাদ তিনটিকে খন্ডন করে বন্ধনকে স্বীকার করেছেন এবং মতবাদ তিনটির অযৌক্তিকতাও প্রমাণ করেছেন।

ব্র্যান্ডা আলমন্ড বন্ধন ও অবন্ধনের মধ্যে বন্ধনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধনের আলোচনা করেছেন। যেহেতু তিনি নারীবাদী দৃষ্টিতে বন্ধনকে ব্যাখ্যা করেছেন তাই এখানে বিষেশত নারী-পুরুষের মধ্যকার বন্ধন আলোচিত হয়েছে। বন্ধনের ক্ষেত্রে তিনি পরিবারকে আবশ্যিক বলে আখ্যায়িত করেন। তবে এই পারিবারিক বন্ধনের ফলে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সভ্যতার আদিতে পারিবারিক বন্ধন ছিল না, তাই তখন মানুষে মানুষে বৈষম্যও ছিল না। পারিবারিক ও বৈবাহিক দুই ধরনের বন্ধনেই বৈষম্য থাকে। কারণ এখানে উত্তরাধিকারের বিষয় চলে আসে। আবার উত্তরাধিকার আইনের সাথে সাথে সম্পত্তি আইনও চলে আসে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে কাজ করলেও এগুলো সমাজে নারী-পুরুষের প্রকৃতি, তাদের কার্যবলীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে যাকে জেন্ডার ইস্যু বলা হয়।

আমাদেরকে পারিবারিক ক্ষেত্রে এসব বৈষম্য দূর করে বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। তাঁর মতে, মানুষ মাত্রই স্বাধীন।[১১] আলমন্ডও মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি Liberation Circleগুএর কথা বলেছেন। তিনি বলেন স্বাধীনতা হল মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাই পারিবারিক বন্ধনে এবং বৈবাহিক বন্ধনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পারস্পরিক স্বাধীনতাকে মর্যদা দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতাই বন্ধনকে গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে। আর ভালবাসাই পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। তাই আলমন্ডের মতে আদর্শ বন্ধন হল পরিবার যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি। পারিবারিক জীবনে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি,

সহমর্মিতাবোধ এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে। কেননা একটি সুখী-সুন্দর জীবনের প্রথম শর্ত হলো প্রেমময় এবং পারস্পরিক দায়িত্বশীল বন্ধন। বন্ধন সুদৃঢ় না হলে সেই পরিবারের সন্তানদের জীবন সুন্দর হবে না। সন্তানের উন্নত জীবনের আশায় আমরা যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করছি তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও কাজে আসবে না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে দেখা দিবে বিবিধ সঙ্কট, তৈরি হবে আস্থাহীনতা, অবক্ষয় ঘটবে নৈতিক ও মানবিকবোধের।

মানবজীবনে বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানের সমস্যাপূর্ণ পৃথিবী থেকে উত্তরণের জন্য মানুষে মানুষে নিবিড় বন্ধন অপরিহার্য। বন্ধনের প্রতি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিকভাবে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে সারাবিশ্বে আজ বন্ধন তথা পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে। উন্নয়নশীল দেশ থেকে শুরু করে উন্নত দেশগুলোতেও পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ বেড়ে গেছে বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীর উল্লেখিত সমস্যাগুলো নিরসন করতে হলে মানব বন্ধনকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বর্তমানের বাসযোগ্য পৃথিবীকে আরো সুখময় ও সুন্দর করে তোলা যাবে মানব বন্ধনকে অটুট করার মাধ্যমে। তাই আমাদেও সবাইকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং একে অপরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। বর্তমান পৃথিবী যেন দিন দিন অবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র যেন মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা ভালবাসা ও বিশ্বাসের অভাব। বিশ্ব জীবনের এই করুণ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানব বন্ধনের। মানব বন্ধনকে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে বিশ্বজীবন পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে মানব জীবন তথা বর্তমান পৃথিবী হয়ে উঠবে কল্যাণকর এক পৃথিবী। কেননা ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিবার, পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ, সমাজের সমন্বয়ে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বিশ্ব। তাই ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রত্যেকের মধ্যে বন্ধনবোধ জাগ্রত হলে অবশ্যই বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে একটি সুন্দর সমাজ। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের মধ্য দিয়ে যে বন্ধনের সূচনা তা ধীরে ধীরে বিশ্ব বন্ধনের রূপ পরিগ্রহ করবে। আর মানব জীবন তখন হয়ে উঠবে স্বার্থক, সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত। তাই অবন্ধনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ব্র্যান্ডা আলমন্ডের সাথে একমত পোষণ করে আমরা বলতে পারি মানবজীবনে বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায় যে, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে মানব বন্ধন তথা পরিবার অপরিহার্য। আধুনিক কালে পরিবারের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গড়ে উঠেছে। যেহেতু একক পরিবারে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, তাই এই একক পরিবারও ভেঙ্গে যাচ্ছে। পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ নিয়ে সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কেবল খন্ড সিদ্ধান্ত পাই। কিন্তু দর্শন এক্ষেত্রে আমাদেরকে সার্বিক সিদ্ধান্ত দেয় এবং মূল্যায়ন করে। তাই আলমন্ড প্রায়োগিক দর্শনের ভিত্তেতে মানব বন্ধন সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। তিনি বন্ধনকে বুঝানোর জন্য এখানে অবন্ধন নিয়েও আলোচনা করেন এবং বন্ধনকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করার কথা বলেন। কেননা বন্ধনের মধ্যে দিয়েই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা অর্থাৎ মানুষের হৃদয়াবেগের বহি:প্রকাশ ঘটানো যায়। যেখানে ভালোবাসা লাভ করে গভীরতা, যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা। আর তখনই সম্ভব হবে একটি অনাগত সুন্দর সমাজ তথা বিশ্ব।

তথ্য নির্দেশ :

১. B. Almond and D. Hill (Ed.) *Applied Philosophy*, Routledge, London and New York, P. 59.

২. Ibid, P. 61.

৩. W. A. Oldfather (Trans), Epictetus; *Arrian's Discourses of Epictetus*, 1985, Book 111 xxiv, PP. 84-87.

৪. গালিব আহসান খান, *দার্শনিক দৃষ্টিতে কাব্য-ভাবনা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৮৩।

৫. Jean Poul Sartre, *Being and Nothingness*, Trans. Hazel E. Barnes, Washington Square Press, 1966, P. 567.

৬. জ্যাঁ পল সার্ত, *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ*, অনুবাদ, শরীফ হারুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-২২।

৭. B. Almond and D. Hill (Ed.) *Applied Philosophy*, P. 65.

৮. রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ-১৩।

৯. মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ-৫৬।

১০. Rashida A. Khanum, *Contemporary Gender Issues*, A H Development Publishing House, 2012, P. 04.

১১. ইমানুয়েল কান্ট, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ-১১১।